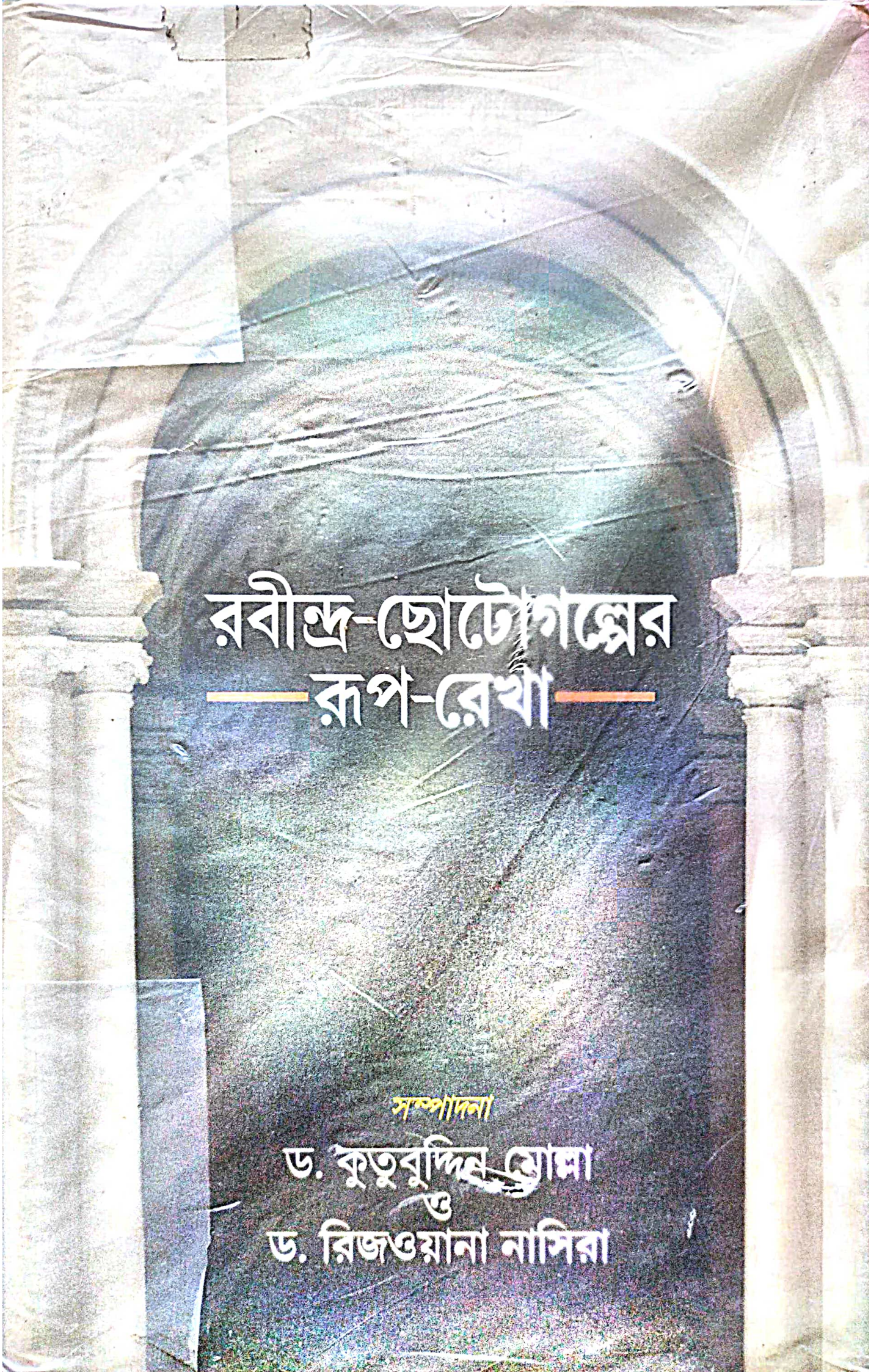

রবীন্দ্র-ছোটগল্পের রূপ-রেখা

সম্পাদনা

ড. কুতুবুদ্দিন মোল্লা

ও

ড. রিজওয়ানা নাসিরা

রবীন্দ্র-ছোটগল্পের রূপ-রেখা

সম্পাদনা
ড. কুতুবুদ্দিন মোল্লা
ও
ড. রিজওয়ানা নাসিরা

বিবেকানন্দ বুক সেন্টার
৫এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলকাতা ৭০০ ০৭৩

Rabindra-Chotogalper Rup-Rekha
edited by Dr. Kutubuddin Molla
&
Dr. Rizwana Nasira

প্রকাশক
পায়েল মাজী
বিবেকানন্দ বুক সেন্টার
১২এ, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলকাতা-৭৩

© রাহাত কামিল

প্রকাশকাল ঃ বৈশাখ ১৪২০ (ইং মে ২০১৩)

ISBN : 978-93-80973-21- 0

মুদ্রণ
ওরিয়েন্ট প্রেস
কলকাতা - ৭০০ ০০৬

মূল্য
₹. ৬০০.০০

সূচীপত্র

ছোটগল্প ও ছোটগল্পকার রবীন্দ্রনাথ	ড. কুতুবুদ্দিন মোল্লা	১
অতিথি	ড. সমরেশ ভৌমিক	২৭
অনধিকার প্রবেশ	ড. দীপঙ্কর ভট্টাচার্য	৪৪
অপরিচিতা	স্বপন কুমার আশ	৪৯
আপদ	বিলাস মণ্ডল	৭০
একরাত্রি	অজিত ত্রিবেদী	৮২
একটা আষাঢ়ে গল্প	ঋতম্ মুখোপাধ্যায়	১২০
কঙ্কাল	উত্তম কুমার মণ্ডল	১২৬
কর্তার ভূত	রঞ্জিত বিশ্বাস	১৩৬
কাবুলিওয়ালা	ললিতা রায়	১৪০
ক্ষুধিত পাষাণ	ড. সালেহা খাতুন	১৫৫
খোকাবাবুর প্রত্যাবর্তন	ড. অদীপ ঘোষ	১৭৪
গুপ্তধন	গোবিন্দ মণ্ডল	১৭৯
ঘাটের কথা	শ্রীময়ী বন্দ্যোপাধ্যায়	২০১
ঘোড়া	ড. অমল মোদক	২০৮
ছুটি	অন্তরা চৌধুরী	২১৫
জীবিত ও মৃত	ড. অর্ধেন্দু মুখোপাধ্যায়	২২২
ত্যাগ	রাখী দত্ত	২৩৬
তিনসঙ্গী	ড. পিন্টু রায়চৌধুরী	২৪১
তোতাকাহিনী	অরুণাভ দাস	২৬৩
দেনাপাওনা	অরুণকুমার সাঁফুই	২৬৯
দুরাশা	হারাধন দাস	২৮২
ধ্বংস	শঙ্করপ্রসাদ মাঝি	২৯৬
নষ্টনীড়	ড. রিজওয়ানা নাসিরা	৩০১
নিশীথে	মহঃ আবদুর রফিক সরদার	৩২৯
পয়লানম্বর	তৌসিফ আহমেদ	৩৩৫
পোষ্টমাষ্টার	স্বপন দে	৩৪৪
প্রথম চিঠি	মধুমিতা সাঁতরা	৩৫৮
বলাই	নকুলচন্দ্র বাইন	৩৬২

বদনাম	রীনা মজুমদার	৩৭১
বোষ্টমী	ড. চন্দনা মজুমদার	৩৯৩
বিচারক	ড. সুমন মজুমদার	৪১১
ব্যবধান	জয়সীমা বিশ্বাস	৪১৭
ভিখারিণী	দেবব্রত চক্রবর্তী	৪২৪
মধ্যবর্ত্তিনী	শ্রীজয়ন্ত মিস্ত্রী	৪৪৭
মহামায়া	মনোরঞ্জন সরদার	৪৫৪
মণিহারা	অনন্যশংকর দেবভূতি	৪৬২
মাস্টারমশাই	সুব্রত পুরকাইত	৪৭৩
মানভঞ্জন	ড. মন্দিরা রায়	৪৮৫
মুসলমানীর গল্প	সাইফুল্লা	৪৯৩
মেঘ ও রৌদ্র	গৌতম দাস	৫০২
রবিবার	নিলয় বক্সী	৫১৭
রামকানাইয়ের নির্বুদ্ধিতা	নাসিরউদ্দিন পুরকাইত	৫৩০
ল্যাবরেটরি	ড. তপন মণ্ডল	৫৪০
শাস্তি	শেখ কামালউদ্দীন	৫৪৭
শেষ কথা	ড. বাবুল হোসেন	৫৫৯
শেষের রাত্রি	ড. রীতারানী পাল	৫৬৭
সমাপ্তি	ড. জয়গোপাল মণ্ডল	৫৭৬
সম্পত্তি সমর্পণ	অরুনাভ চক্রবর্তী	৫৮৮
সুভা	সাহাবুদ্দিন মণ্ডল	৬০৬
সুয়োরানীর সাধ	নির্মাল্য মণ্ডল	৬১২
স্ত্রীর পত্র	ড. কুতুবুদ্দিন মোল্লা	৬২৪
স্বর্ণমৃগ	ড. সৌমিত্র বসু	৬৪৬
হালদার গোষ্ঠী	নবনীতা বসু	৬৫৪
হৈমন্তী	ড. মিঠু মল্লিক	৬৭৫

তিনসঙ্গী ঃ ব্যক্তিত্বময়ী নারীর সন্ধানে

—ড. পিন্টু রায়চৌধুরী

রবীন্দ্র ভাবনায় প্রবল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের বীজ রোপিত হয়েছিল পারিবারিক সূত্রে। ঊনিশ শতকীয় রক্ষণশীল সমাজের বাধা ভেঙে জোড়াসাঁকোর ঠাকুর পরিবার নিজেদের স্বতন্ত্র বৈশিষ্ঠ্য ও পরিচয় গড়ে তুলেছিল। রবীন্দ্রনাথের পিতামহ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর, পিতা দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, বড় দাদা সত্যেন্দ্রনাথ ও তাঁর স্ত্রী জ্ঞানদানন্দিনী, মেজদাদা জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ও তাঁর স্ত্রী কাদম্বরী দেবী, বড়দিদি স্বর্ণকুমারী দেবী প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ নিজ নিজ ক্ষেত্রে প্রবল ব্যক্তিত্ব ও প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। বাল্যকালে এই সব সংস্কারমুক্ত মানুষের সংস্রবে পরোক্ষে বা প্রত্যক্ষে পুষ্টিলাভ করেন রবীন্দ্রনাথ। পরবর্তীকালে বিশ্ব পরিব্যাপ্ত সমাজ ও প্রকৃতির অনুষঙ্গে, রবীন্দ্রনাথের স্ব-কীয় ব্যক্তিত্বের একাধিক শাখা-প্রশাখা প্রস্ফুটিত হয়।

বিশ্ববাসীর কাছে রবীন্দ্রনাথ একজন কবিরূপেই সর্বাধিক পরিচিত। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের পাঠককুল জানেন—কবি বললে রবীন্দ্রনাথকে কেবলমাত্র কুড়ি শতাংশ স্বীকৃতি দেওয়া হয়। তাঁর কবিকৃতীকে ছাপিয়ে সৃষ্টির সর্বস্তরে গড়ে ওঠে এক স্বতন্ত্র শিল্পীসত্তা। কেবলমাত্র রবীন্দ্র ছোটগল্পের সৃষ্টিসম্ভার পর্যালোচনা করেই আমাদের চমক লাগে। সমাজ ও সময়ের নিকট সম্পর্ককে মেনেও তাঁর একাধিক ছোটগল্পে নারীর দৃঢ় প্রতিবাদিনী চরিত্রাঙ্কন হয়ে ওঠে মানব ব্যক্তিত্বের প্রতীক। তবুও সমালোচক মহলে নারীমুক্তির সহায়করূপে রবীন্দ্রনাথ সর্বজন স্বীকৃত নয়। আবার বেশ কিছু বছর ধরে পাশ্চাত্য নারীবাদের সূত্র মেনে ভারতীয় লেখকের রচনাতে নারীবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করার যে প্রয়াস দেখা যাচ্ছে রবীন্দ্রনাথ সেখানেও ব্রাত্য। এখানেই আমাদের প্রশ্ন, রবীন্দ্রনাথ কি তবে নারীবাদের বিপক্ষে? এই প্রশ্নের মীমাংসা খোঁজার পূর্বে একটু নারীবাদের স্বরূপ সন্ধান করা যাক।

নারীবাদ আসলে নারীর স্বাভাবিক বিকাশ ও অধিকার প্রতিষ্ঠার লড়াই, অথবা দীর্ঘদিনের পুরুষতান্ত্রিক পরিকাঠামোর বাইরে নারীর ব্যক্তিগত পরিচয় স্থাপনের জন্য সংগ্রাম। নারীবাদের জন্ম আঠারো শতক থেকে এক এক করে নারীর ভোটাধিকার, শিক্ষার অধিকার, স্বোপার্জিত অর্থ স্বাধীনভাবে ব্যয় করার অধিকার, ইত্যাদি নিয়ে আন্দোলন দানা বাঁধতে থাকে। কিন্তু আমাদের দেশে নারীমুক্তি প্রচেষ্টাগুলি অনেক পরে সক্রিয়তা পায়। ভারতের মহিলাদের ভোটের অধিকার কার্যকর হয় ১৯২৯ সালে। এই ভোটাধিকারে তিনটি শর্ত যুক্ত ছিল (১) নারীকে বিবাহিত হতে হবে (২) তাকে

সম্পত্তির অধিকারী হতে হবে (৩) তাকে শিক্ষিত হতে হবে। বিংশ শতকের গোড়া থেকে স্বাধীনতা আন্দোলনের বিভিন্ন কর্মসূচীর মাধ্যমে নারী পুরুষ একত্রে কাজ করেছে। সেখানে দেশকে স্বাধীন করা মূল লক্ষ্য হলেও পরোক্ষভাবে নারীর শৃঙ্খলও কিছুটা শিথিল হয়েছিল। বিভিন্ন রাজনৈতিক কর্মসূচির সংযোজন হিসাবে হয়ত কখনো নারীর সমস্যার কথা উত্থাপিত হয়েছিল অথবা সমাজে একটা আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া হিসাবে নারী কিছু কিছু সুযোগ পেয়েছে। কিন্তু আধুনিক নারীবাদের মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় ভারতবর্ষ এখনও দুর্বল মনোভাব পোষণ করে। এই দুর্বলতার কেন্দ্রে সামাজিক-অর্থনৈতিক-পারিবারিক রাজনীতি ও নৈতিকতার আদর্শ জড়িত থাকলেও মূল সমস্যার সাথে জড়িয়ে আছে লিঙ্গ বৈষম্যের চাপ এবং সেই সম্পর্কিত বহুমাত্রিক মানবিক মনস্তত্ত্ব।

বলাই বাহুল্য, লিঙ্গ-পরিচয়ের মধ্যেই বৈষম্যভাবনা নিহিত রয়েছে। ঘরে এবং বাইরে যেখানেই নারী ও পুরুষ অবস্থান করে সেখানেই তারা তাদের লিঙ্গ পরিচয় বহন করে। লিঙ্গ সমস্যা অপরাপর সমস্যার সঙ্গে যুক্ত হয়ে জটিল রূপ ধারণ করে। আমাদের মতন তৃতীয় বিশ্বের মেয়েদের সমস্যা শুধু লিঙ্গ জনিত নয়। তার জীবনের সমস্যা ঔপনিবেশিকতা, বিত্ত, বর্ণ ও লিঙ্গের সংমিশ্রণে এক বিচিত্র জটিলতার সৃষ্টি করে। এই জটিল পরিস্থিতির ব্যাখ্যা একান্তভাবে মানবিক মনস্তত্ত্বের বিষয়। মানবিক মনস্তত্ত্বের নিয়ন্তা যেহেতু মন এবং মনের গতিবিধি ব্যক্তিমাত্রই ভিন্নতর জৈবনিক বিষয়, তাই মানুষের বায়োলজিক্যাল গঠন এক্ষেত্রে চরিত্রের নির্ধারক হয়ে ওঠে। সাধারণভাবে নর-নারীর জৈবিক বৃত্তি বলতে যৌন-পরিচয় (Sex-identity), যা ক্রোমোজোম এবং হরমোনের রসায়নের উপর নির্ভরশীল। নারীর জীবকোষে (female cell) কেবলমাত্র 'x' ক্রোমোজোম (chromosome) থাকে এবং পুরুষের জীবকোষে 'x' এবং 'y' দুই প্রকার ক্রোমোজোম থাকে।

নারী ও পুরষের হরমোন এক। ক্রোমোজোম ভেদে একই হরমোন ভিন্ন ভিন্ন রসায়ন সৃষ্টি করে। সব পুরুষের হরমোনের রসায়ন এক নয় আবার সব নারীরও হরমোনের রসায়ন এক নয়। ফলে পার্থক্যটা শুধু নারী ও পুরুষের পার্থক্য নয়, প্রভেদটা ব্যক্তিতে-ব্যক্তিতে দেখা যায়। ব্যক্তি বিশেষে এই যে প্রভেদ এটাকেই বলা হয় ব্যক্তিত্ব। সকলের ক্ষেত্রে ব্যক্তিত্বকে অনুধাবন করা খুব একটা সহজ ব্যাপার হয় না, এর জন্য প্রয়োজন নির্ভেজাল ও নিরপেক্ষ একটা মন। মনস্তাত্ত্বিক মতানুসারে মনের ভাব ও গতিকে নিয়ন্ত্রণ করে যে যৌন (sex) বা লিঙ্গ (genders) পরিচয়, সেটাই সবচেয়ে বড় বাধা। প্র[illegible]টি সভ্য সমাজে নারী ও পুরুষের কাছে বিশেষ কতকগুলি আচরণ প্রত্যাশা করা [illegible]াচরণ যারা অনুশীলন করে তাদের আদর্শ নারী এবং আদর্শ পুরুষরূপে

চিহ্নিত করা হয়—আর এই এই গুণগুলিই যথাক্রমে পুরুষালি গুণ ও মেয়েলি গুণ রূপে গণ্য হয়। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়—পুরুষ বেশি যুক্তিবাদী এবং নারী বেশি সংবেদনশীল। কিন্তু সমাজ প্রত্যাশা করলেই যে যে কোন নারী বা পুরুষ সেইমতো আচরণ করবে তা নাও হতে পারে। একজন নারী ইচ্ছে করলে পুরুষের গুণের চর্চা করতে পারে আবার নারীর গুণের চর্চা করতে পারে পুরুষ। সেক্ষেত্রে পূর্বকথিত জেণ্ডার আইডেনটিটি ভেঙে পড়ে। জেণ্ডার বা লিঙ্গ পরিচয় সমাজ আরোপিত বলেই এইরূপ সম্ভব হয়। নারীবাদের মূলে আছে এই জেনেটিক সত্তাগুলির উর্দ্ধে স্বাধীন চিন্তা ও মত প্রকাশের উপযোগী নতুন প্ল্যাটফর্ম গঠনের লড়াই। সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক মূল্যবোধটা সেখানে বিচার্য নয়; শুধুমাত্র দীর্ঘকালের নারী-পুরুষ বৈষম্য দূরীকরণের প্রয়োজনই তার প্রধান লক্ষ্য। এই লক্ষ্যের পথেও নারীবাদী তাত্ত্বিকরা দ্বিধাবিভক্ত। একদল প্রচারকারীরা, নারীর সব ধরনের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সোচ্চার—তারা লিবারাল। লিবারাল নারীবাদীরা মনে করেন যে, ব্যক্তি-জীবনে সুবিচার পেতে গেলে ন্যায়নীতির (Principle of Justice) দ্বারস্থ হতেই হবে। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-লিঙ্গ নির্বিশেষে ন্যায়বিচার সকলেরই প্রাপ্য; তাই তাঁরা এমন বিধির সন্ধান করছেন যা নারী পুরুষের লিঙ্গ-পরিচয়ের ঊর্ধ্বে। এক্ষেত্রে নারীর যে কোন ধরনের সমস্যা যুক্তির দ্বারা সমাধান করতে হবে। তাঁরা চান সব ধরনের সামাজিক চর্যায় পুরুষের পাশাপাশি নারীর অন্তর্ভুক্তি। তাঁদের যেন পুরুষদের সমান শিক্ষার অধিকার দেওয়া হয়, কর্ম-নিযুক্তির অধিকার দেওয়া হয়। গৃহস্থালির কাজকে ঘিরে যে রাজনীতি চলে সেটা লিবারালদের ভাবায়। তেমনি ভাবায় বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম ও বিজ্ঞাপনের ভাষায় ও চিত্রে নারীর অবমাননা। এর প্রতিকার হিসাবে তাঁরা আরো কড়া আইন চান। এই উদ্দেশ্যে লিবারাল নারীবাদীরা আমেরিকায় ১৯৬৬ তে একটি সংগঠন (NOW–National Organization for Women) তৈরী করে তাঁদের দেশের রিপাবলিকান এবং ডেমোক্রাটিক পার্টির কাছে আট-দফা দাবি পেশ করেন।

লিবারাল নারীবাদীদের মতে র‍্যাডিকাল নারীবাদীরা যুক্তি ও ন্যায়নীতির দ্বারস্থ হতে চান না। তাঁরা মনে করেন ব্যক্তিগত স্বার্থ প্রতিষ্ঠায় সুবিচারের প্রত্যাশা করতে গিয়ে নারী এক গৃহস্বামীর পিতৃ-তান্ত্রিক নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্তি পেয়ে আরো বৃহৎ পটভূমিতে রাষ্ট্ররূপী পিতৃতন্ত্রের কাছে নিজেকে সমর্পণ করে। ফলে আমেরিকায় ১৯৬৭ সালে একদল মহিলা NOW এর সদস্যপদ ত্যাগ করে র‍্যাডিকাল নারীবাদের জন্ম দেন। র‍্যাডিকাল নারীবাদীরা সবসময় বৈষম্যের মূল কারণ খোঁজার চেষ্টা করেন। তাঁরা লিবারালদের মতো মনে করেন না যে সব জায়গায় সঠিক প্রিন্সিপ্যালের অভাবেই লিঙ্গ বৈষম্য দেখা দেয়—আসলে পুরুষের স্বার্থপরতা (Self interest) এবং ক্ষমতার (Power) আস্ফালন বৈষম্যের জন্য দায়ী। তাই লিঙ্গ বৈষম্য দূর করতে গেলে নারী-পুরুষ লিঙ্গ-পরিচয়ের মধ্যে সাম্যভাবনা আনা প্রয়োজন। সব ধরনের পুরুষতান্ত্রিক

পরিকাঠামোর বন্ধন ছিন্ন করে নারী-পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্কের মধ্যে দিয়ে নিজের selfhood construction বা ব্যক্তিক সত্তা গঠন করতে পারলেই নারীর সব অবমাননা দূর হবে।

আধুনিক থেকে উত্তর-আধুনিকতায় উত্তরণ হল সজীবতার বা এগিয়ে চলার ধর্ম। এই চলার পথে কবি গতিবাদে বিশ্বাসী হলেও পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিক বিবর্তনবাদের সঙ্গে রবীন্দ্র উপলব্ধিকৃত গতিচেতনার পার্থক্য আছে। পাশ্চাত্য গতিচেতনার অর্থ কেবলই হয়ে ওঠা—being । কিন্তু কেন এই হয়ে ওঠা, কোন্ ধ্রুব শ্রেয়কে অভিব্যক্ত করবার জন্য—তার কোনো সদর্থক উত্তর নেই। পাশাপাশি উপনিষদীয় ভাবলালিত রবীন্দ্রনাথ অকারণ অবারণ গতির কথা বলতে গিয়েও শেষ পর্যন্ত গতির পরিণামে এক পরম সত্যের উপলব্ধি করেছেন। কবির এই চিন্তার সঙ্গে পদার্থবিজ্ঞানের মূল তত্ত্বের মিল আছে। Potential energy-কে যেমন আপাতগতিহীন মনে হয়, কিন্তু তার থেকেই অভিব্যক্ত হয় Kinetic energy (যেমন ব্যাটারির অভ্যন্তরস্থ স্থির বিদ্যুৎ কোথাও আলোক রূপে, কোথাও তাপ রূপে, কোথাও শৈত্য রূপে, কোথাও যান্ত্রিক শক্তিরূপে অভিব্যক্ত) (তেমনি কবির মতে 'প্রেমই' সেই Potential উৎস। প্রেমই প্রেরণারূপে কেন্দ্রে অবস্থান করে সকল কিছুকে ক্রিয়াশীল করে। গতিবাদ সত্য, কারণ প্রেম সত্য। রবীন্দ্র মানসের কেন্দ্রবিন্দুতে এই প্রেম সদা সক্রিয় ছিল। বর্তমান আলোচনার সূচনায় যে বিশ্ব পরিব্যাপ্ত সমাজ ও প্রকৃতির অনুষঙ্গ উল্লেখিত হয়েছে তা ঐ প্রেমের মহত্ব ও সজীবতাকে বোঝানোর উদ্দেশ্যে। যে কোনো প্রকার বাধা ও শাসন (বাইরের ও অন্তরের) ভেঙে ফেলে, মানবাত্মার জয় ঘোষণা করাই রবীন্দ্রনাথের প্রধান লক্ষ্য। তাই নারীবাদী ধারনায় যা কিছু লিবারাল, র‍্যাডিকাল— রবীন্দ্র ভাবনায় তা মিলে মিশে এক হয়ে যায় প্রেমের জাদুস্পর্শে। আর এখান থেকেই প্রাচ্য নারী ভাবনায় যোগ হয় এক নয়া মাত্রা। নারী-পুরুষ উভয়ের মধ্যে কোনো বিরোধ নয়; একত্র সহাবস্থান ও পারস্পরিক ব্যক্তিত্বের প্রতি নিরপেক্ষ মর্যাদা দান করার কথা ধরা পড়ে তাঁর একাধিক রচনায়। রবীন্দ্রনাথের যৌবনে রচিত কাব্যনাট্য 'চিত্রাঙ্গদা'-য় অর্জুনকে বলেন—

"যদি পার্শ্বে রাখ/মোরে সংকটের পথে, দুরূহ চিন্তার/যদি অংশ দাও, যদি অনুমতি কর/কঠিন ব্রতের তব সহায় হইতে,/যদি সুখে দুঃখে মোরে কর সহচরী,/আমার পাইবে তবে পরিচয়।"

'চিত্রাঙ্গদা' রচিত হয় ১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে। আমেরিকায় লিবারাল নারীবাদের জন্ম ১৯৬৬ খ্রীষ্টাব্দে। এর ঠিক এক বছর পরে র‍্যাডিকাল নারীবাদের জন্ম। আমাদের একথা ভুললে চলবে না, নারীবাদী স্বরগুলি জনমানসে প্রচারিত হবার বহু পূর্বেই রবীন্দ্রনাথ নারী-পুরুষ সাম্যের কথা ঘোষণা করেছেন। অথচ রবীন্দ্র সমসাময়িক পর্বে ভারতীয় তথা বাঙালি

সমাজে নারী-পুরুষের লিঙ্গ বৈষম্য, মানসিকতার বৈষম্য, ঘরে-বাইরে সর্বত্র বিরাজমান ছিল। সেই সময়, রবীন্দ্র সৃষ্ট বিশেষ কিছু নারী চরিত্রের পরিকল্পনা সত্যিই আশ্চর্যজনক। চিত্রাঙ্গদা একজন সচেতন নারী। সে জানে পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষের সাথে সহাবস্থান করেও কিভাবে নিজের স্বাতন্ত্র্য ধরে রাখতে হয়। নারীবাদের মূলে আছে ঐ ব্যক্তিসত্তা প্রতিষ্ঠার লড়াই।

গোষ্ঠী আর ব্যক্তি আলাদা হলেও ব্যক্তিত্বের প্রভাব পড়ে গোষ্ঠীর ওপর। যে সমাজ মানবিক মূল্যবোধহীন সেখানে ব্যক্তিস্বাধীনতার অধিকার দাবি করা চলে না। বাইরের অভিঘাতে সচল হয়ে নিজের ব্যক্তিত্বের বীজ বপন করতে হয় নিজেকেই। রবীন্দ্রনাথের গল্প-উপন্যাসে এমন অনেক নারী চরিত্রের একত্র সহাবস্থান আছে; যাঁরা একই সাথে ঐতিহ্য অনুসারী, আবার স্বাধীনচেতা সমাজ বিদ্রোহিণী। গতিবাদের সূত্র মেনে সময়ের সাথে সাথে রবীন্দ্র সৃষ্ট নারী চরিত্রগুলিও পাল্টে যায়। তাঁর প্রথম দিকের গল্প-উপন্যাসের চিত্রিত মহিলারা নিঃসন্দেহে ঐতিহ্যিক এবং নিষ্ঠুর দেশাচারের দ্বারা নিপীড়িত। তারা নীরবে গুরুজনদের ন্যায়-অন্যায় আদেশ মেনে চলে। রবীন্দ্রনাথের এসব রচনায় বাল্য বিধবার শোচনীয় অবস্থা, একান্নবর্তী প্রথার নিপীড়ন, বহুবিবাহ প্রথা, এবং বাল্য বিবাহের কুফলের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। মহিলাদের ওপর শারীরিক নির্যাতনের কথাও বলা হয়েছে। অশিক্ষিত এবং সাংস্কৃতিক গুণাবলি-বর্জিত ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটেনি। কঠোর অবরোধ প্রথার চিত্রও উপন্যাসের বহু স্থানে বিধৃত।

অবশ্য তাঁর শেষ দিকের রচনায় পরিবর্তিত নারীসত্তার পরিচয় আছে। তাঁর শেষ দিকের নায়িকারা ব্যক্তিত্ব এবং জীবন ও জগতের প্রতি মনোভাবে সত্যিই স্বাধীন। সমাজ ও পারিবারিক গণ্ডীর সীমবদ্ধতা সত্ত্বেও এই মহিলারা যথেষ্ট পরিণত এবং নিজেদের কথা নিজেরাই ভাবতে সক্ষম। মোহিনী, শৈল, কাদম্বিনী, এবং সোনামণির মতো প্রথম দিককার বিধবাদের তুলনায় বিনোদিনী, দামিণী, ননীবালা, মঞ্জুলিকা এবং সোহিণীর মতো বিধবা নিঃসন্দেহে ভিন্ন ধরনের। শেষ দিকের মহিলারা খুব ঐতিহ্যিক নয়, তারা এমন এক দৃষ্টিকোণ থেকে সমাজকে দেখে যা রক্ষণশীল সামাজিক মূল্যবোধের পরিপন্থী। নিরুপমা এবং বৃন্দাবনের স্ত্রী নীরবে সকল অত্যাচার সহ্য করে এবং পরিণতিতে মৃত্যুকে স্বীকার করে নেয়। কিন্তু 'স্ত্রীর পত্র' গল্পের মৃণাল এদের থেকে আলাদা চরিত্র। ১৫ বছর বিবাহিত জীবন যাপনের পর, সে তার স্বামী ও সংসার ত্যাগ করে এবং নিজেকে দেখতে পায় উপযুক্ত নীল আকাশের নিচে, যেখানে সে তার দীর্ঘ প্রত্যাশিত স্বাধীনতার সঙ্গে শ্বাসপ্রশ্বাস নিতে পারে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কয়েকটি গল্প ও কবিতায় একান্নবর্তী প্রথার নিন্দা করেছেন কিন্তু তার মধ্যে 'স্ত্রীর পত্র' স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত হবার কারণ—এ গল্পের নায়িকা মৃণালের ব্যক্তিত্ব বিকশিত হয়েছে এবং শেষ পর্যন্ত সে বাঙালি মধ্যবিত্তদের বহু যত্নে লালিত সামাজিক মূল্যবোধের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে।

এই সমাজের পরিবর্তন অবশ্য একদিনে বা একজনের চেষ্টায় হয়নি। অসংখ্য সমাজকর্মীর মহৎ প্রচেষ্টার ফলেই বাঙালি মহিলারা বর্তমান অবস্থায় উন্নীত হয়েছেন। রক্ষণশীল সামাজিক মূল্যবোধকে অগ্রাহ্য করে রবীন্দ্রনাথ এবং তাঁর পরিবারের সদস্যরা নারীমুক্তির অনেকগুলি উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের কৃতিত্ব এটাই যে তিনি নারীকেও একজন মানুষ রূপে পূর্ণ মর্য্যাদা ও প্রতিষ্ঠা দিতে চেয়েছিলেন। তাঁর বাস্তব জীবন এবং সৃজনশীল সাহিত্য জীবনের মধ্যে হয়তো একাধিক অসঙ্গতি ছিল; কিন্তু সেই সব থেকে শিক্ষালাভ করেই তো রবীন্দ্রনাথ নিজেও একজন আদর্শ ব্যক্তি-পুরুষ হয়ে উঠেছিলেন। রবীন্দ্রসৃষ্ট গল্প-উপন্যাসে ঠিক সেভাবেই বাঙালি নারীর ব্যক্তি-নারী হয়ে ওঠার রূপ চিত্রিত হয়েছে। প্রথমে সেই ব্যক্তিত্ব সামাজিক ন্যায়-নীতির করাল গ্রাসে আচ্ছাদিত থাকলেও, এতকালের অবহেলিত ও অবদমিত নারীসত্তার উত্তরণ চিত্র স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তাঁর শেষ পর্বের রচনায়। নারীকেন্দ্রিক ভাবনায় এটাই ছিল রবীন্দ্রনাথের চূড়ান্ত উপলব্ধি যার স্বচ্ছ প্রতিচ্ছবি ধরা পড়ে 'তিনসঙ্গী'র তিনটি গল্পে।

রবীন্দ্র গল্প ভাবনায় 'তিনসঙ্গী'র গল্পত্রয়ী এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। একটু নিবিড় পর্যবেক্ষণ করলেই বোঝা যাবে নারীর 'Selfhood Construction' বা ব্যক্তিক সত্তা গঠন করতে গিয়ে কোনওরূপ সংস্কার বা ঐতিহ্যকে লেখক প্রাধান্য দেননি। রবীন্দ্রনাথের সমগ্র জীবনের নারী ভাবনার নির্যাস, তাদের পাওয়া না-পাওয়ার দ্বন্দ্ব, ভালোবাসার অধিকার ও সীমা নির্দেশিত হয়েছে এই গল্পগুলিতে। দ্বন্দ্বজর্জর বৈষ্ণব কবির কাছে যেমন সম্ভোগ ও বিরহ দুই-ই সত্য; রবীন্দ্রনাথের কাছে তেমনি ঐতিহ্যিক নারী আর ঐতিহ্য বিরোধী নারী উভয় সত্য। দুই কবির লক্ষ্য এক—তা হল এক আদর্শায়িত সত্যের কাছে আত্মসমর্পণ। তাই সব চাওয়া-পাওয়ার শেষে বিদ্যাপতি আত্মসমর্পণ করেন নিত্য প্রেমাস্পদের পদতলে, আর রবীন্দ্রনাথের কাছে স্বীকৃতি পায় নতুন যুগের উপযোগী ব্যক্তিত্বময়ী নারী। যে নারী পুরুষতান্ত্রিক পরিকাঠামোর বন্ধন ছিন্ন করে নারী-পুরুষের পারস্পরিক সম্পর্কের ভেতর থেকে গঠন করে নিতে পারে নিজের ব্যক্তি পরিচয়।

রবীন্দ্র ছোটগল্পে নারীর ব্যক্তিত্ব জাগরণের এক কালজয়ী রূপ বিধৃত হয়ে আছে রবিবার, শেষকথা, ও ল্যাবরেটরী গল্পে। তবে এই গল্পগুলি বিচারের পূর্বে আরও কিছু গল্পে নারীর স্বতন্ত্র ভূমিকা স্মরণযোগ্য, সেই গল্পগুলি হল—মহামায়া, শাস্তি, দিদি, মানভঞ্জন, দুরাশা, হৈমন্তী, স্ত্রীর পত্র, অপরিচিতা, পয়লা নম্বর, বদনাম ও মুসলমানীর গল্প। প্রথম পর্যায়ে উল্লেখ করা যায় পাঁচটি গল্প—মহামায়া, শাস্তি, দিদি, মানভঞ্জন ও দুরাশা। এই গল্পগুলি ১৮৯২-১৮৯৮ এর মধ্যে লেখা। এরপর ১৯১৪ থেকে ১৯১৮ এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ লেখেন হৈমন্তী, স্ত্রীর পত্র, অপরিচিতা, পয়লা নম্বর গল্পগুলি। জীবনের শেষ পর্বে ১৯৩৬ থেকে ১৯৪১ এর মধ্যে লেখেন তিনসঙ্গীর গল্প তিনটি

এবং বদনাম ও মুসলমানীর গল্প। উল্লেখিত প্রতিটি গল্পে পুরুষতান্ত্রিক পীড়ণ ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে নারীর প্রতিবাদের চরম রূপ অঙ্কিত হয়নি। অথচ পুরুষতান্ত্রিক প্রভাবকে দৃঢ় বিশ্বাসে কাটিয়ে উঠেছে নারী। পারিবারিক পরিকাঠামোর ভেতরে থেকে অথবা বাইরে বেরিয়ে এসে নারী ঘুরে দাড়িয়েছে। এই ঘুরে দাঁড়ানো হতে পারে নিরুচ্চার তবে দৃঢ়, হতে পারে হাস্যের অন্তরালে আবৃত নীরব আত্মদহন—কিন্তু তা আত্মসমর্পন নয়। হতে পারে বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের এবং কর্তৃত্বের আস্বাদ, অথবা সরাসরি বিদ্রোহ। এই রকমফেরের কারণ, ঘটনাগত ও পরিস্থিতিগত পার্থক্য, যা সেই নারী স্বভাবের মৌল বৈশিষ্ট্য। আমরা উল্লেখিত গল্পগুলিতে এই বৈচিত্র্যের স্বরূপ দেখে নেব।

ঊনবিংশ শতকের একেবারে শেষ দিকে ১২৯৯ সালে লেখা মহামায়া গল্পে এক বিদ্রোহিণী নারীর ব্যক্তিসত্তার প্রবল রূপ চিহ্নিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ এই গল্পে ঘটনার দিক থেকে কিছুটা অতীতে চলে গিয়েছেন। তখন দেশে ভয়াবহ কৌলিন্য প্রথা এবং সহমরণও প্রচলিত ছিলো। অসবর্ণ রাজীবের সাথে মহামায়ার সম্পর্কের কথা জানতে পেরে তার দাদা এক মৃত্যুপথযাত্রী কুলীন বৃদ্ধের সাথে বোনের বিয়ে দিয়েছিলো। পরিণামে স্বামীর মৃত্যু এবং সহমরণের চিতায় নারীব্যক্তিত্ব একেবারে লেলিহান শিখায় জ্বলে উঠল। নায়িকা মহামায়া সামান্য সুযোগ পাওয়া মাত্র সহমরণের চিতার আগুন থেকে উঠে এসে রাজীবের কাছে শর্তাধীন দাম্পত্য কামনা করেছে। দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ মহামায়া রাজীবকে ভালোবাসর অধিকারেই মৃত্যুকে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে অর্ধদগ্ধ অবস্থায় প্রেমিকের কাছে থাকতে এসেছে, কিন্তু করুণার পাত্র হয়ে নয়। এ প্রসঙ্গে মহামায়ার উক্তি—

"হাঁ। আমি তোমার কাছে অঙ্গীকার করিয়াছিলাম, তোমার ঘরে আসিব। সেই অঙ্গীকার পালন করিতে আসিয়াছি। কিন্তু রাজীব, আমি ঠিক সে আমি নই, আমার সমস্ত পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে। কেবল আমি মনে-মনে সেই মহামায়া আছি। এখনও বলো, এখনও আমার চিতায় ফিরিয়া যাইতে পারিব। আর যদি প্রতিজ্ঞা কর, কখনও আমার ঘোমটা খুলিবে না, আমার মুখ দেখিবে না—তবে আমি তোমার ঘরে থাকিতে পারি।"

কিন্তু যে মুহূর্তে মহামায়ার দগ্ধ মুখ প্রণয়ী দেখতে পেয়েছে, তার মনে হয়েছে এবার প্রেমিক রাজীবের প্রেমে করুণার স্পর্শ লাগবে—অমনি সে তাকে ত্যাগ করে চলে গেছে। গল্পের শেষ অংশে মহামায়ার নিরুত্তাপ গৃহত্যাগে পুরুষতান্ত্রিক নির্ভরশীলতাকে ভেঙে বেরিয়ে আসার সাহস প্রদর্শিত হয়েছে।

১৩০০ সালে প্রকাশিত শাস্তি গল্পে গ্রাম্য চাষী-বউ চন্দরা একই রকমভাবে নিশ্চুপ প্রতিবাদ জানিয়েছে পুরুষতান্ত্রিক শাসনের বিরুদ্ধে। পরিণামে পুরুষতান্ত্রিক বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে নিজের মৃত্যুকে হাতিয়ার করে চরম প্রত্যাঘাতে জর্জরিত করেছে নিজের স্বামীকে এবং গোটা সমাজকে। ঘটনাচক্রে বড়-জাকে চন্দরার ভাসুর

রাগের মাথায় খুন করে ফেলল। সেই খুনের দায় তার স্বামী চাপিয়ে দিল বউয়ের ওপরে। এ প্রসঙ্গে ছিদামের যুক্তি—"বউ গেলে বউ পাইব, কিন্তু আমার ভাই ফাঁসি গেলে আর তো ভাই পাইব না।" ছিদামের কাছে চন্দরার কোন ব্যক্তিসত্তা নেই, সে কেবল 'বউ' মাত্র। এই ব্যক্তিত্বহীনতার গ্লানি চন্দরাকে গ্রাস করেছিল বলেই স্বামীর সাজানো যুক্তির বদলে দৃঢ় প্রত্যয়ে মৃত্যুকে আঁকড়ে ধরে চন্দরা। জেলখানায় ফাঁসির পূর্বে তার স্বামী একবার স্ত্রীর মুখ দেখার বাসনা প্রকাশ করায় চন্দরার শেষ উক্তি—'মরণ!' যেন সমগ্র পুরুষতান্ত্রিক সমাজের বিরুদ্ধে তীব্র কষাঘাত স্বরূপ।

১৩০১ সালে প্রকাশিত 'দিদি' গল্পে জননীর প্রতিনিধি দিদি অসহায় ভাইয়ের প্রতি কর্তব্য সাধনে নিজের স্বামীর বিরুদ্ধেও কঠোর হতে পেরেছে। স্বামীর বিরুদ্ধে শশীর প্রতিবাদ নীরবে সক্রিয় এবং সমাপ্তিতে তা বিস্ফোরিত। লোভী স্বামীর হাত থেকে বাঁচিয়ে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের কাছে ভাইকে পৌঁছে দেবার মানসিকতায় শশীর নীরব ব্যক্তিত্ব প্রদর্শিত হয়েছে।

১৩০২ সালে প্রকাশিত 'মানভঞ্জন' গল্পের নায়িকা রূপের প্রসাধনে স্বামীর মন ভোলাতে না পেরে তীব্র ভাবে মর্মাহত হয়েছিল। তার স্বামী ছিলো লম্পট, বাইরে মদ ও মেয়েদের নিয়ে স্ফূর্তি করে বেড়ায়। স্বামীর কাছে ভালোবাসার প্রত্যাশা বিঘ্নিত হবার পর ধনীর সংসারে অবহেলিত স্ত্রী হয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে গৃহত্যাগ করে অভিনেত্রীর স্বাধীন ও উচ্ছৃঙ্খল জীবনকে স্ব-ইচ্ছায় বেছে নেয় গিরিবালা।

১৩০৫ সালে প্রকাশিত 'দূরাশা' গল্পের নায়িকা নবাবকন্যা হওয়া সত্ত্বেও সমস্ত সুখ ভোগের জীবনকে ত্যাগ করেছিল এক দেশভক্ত সিপাহীর আদর্শকে ভালোবেসে। অবশেষে বহু বছর পরে কেশরলালকে সে খুঁজে পেল এক ভুটিয়া পল্লীতে, কোম্পানির ফৌজের কাছ থেকে পালিয়ে শেষ পর্যন্ত এক তুচ্ছ জীবনে সে বেঁচে রয়েছে। এবার নবাবজাদীর দীপ্ত চরিত্রের দ্বিতীয় বিদ্রোহের সূচনা। সে আদর্শবাদ, বিশ্বাস সব কিছু ঘৃণায় বিসর্জন দিয়ে একক বিদ্রোহের প্রতীকী চরিত্র হয়ে উঠলো।

১৩২১ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে প্রকাশিত 'হৈমন্তী' গল্পে বধূনির্যাতনের বিরুদ্ধে হৈমন্তীর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য স্বামী সংসারের বিরুদ্ধে অন্য মাত্রা পেয়েছে। হৈমন্তী ছোটবেলা থেকে বাবার সাহচর্যে, বাংলার সাংসারিক ক্ষুদ্রতার বাইরে বই পড়ে বড় হতে হতে এক ধরনের ব্যক্তিত্ব লাভ করেছিল। সংসারজীবনে স্বামী তাকে স্পর্শ করলেও তার অন্তরের মুক্তিমন্ত্রের সঙ্গী হতে পারে নি। শ্বশুরবাড়ির সাংসারিক ক্ষুদ্রতাকে নীরব ধিক্কার জানিয়ে বাবার প্রতি হৈমন্তী সরব হয়েছে এই বলে—

"বাবা আর যদি কখনো তুমি আমাকে দেখিবার জন্য এমন ছুটাছুটি করিয়া এ বাড়িতে আস তবে আমি ঘরে কপাট দিব।" তার এই সরব উক্তির পশ্চাতে কঠোর ব্যক্তিত্বের

পরিচয় স্পষ্ট।

১৩২১ সালে শ্রাবণ মাসে প্রকাশিত 'স্ত্রীর পত্র' গল্পের নায়িকা মৃণালের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য পাঠককে চমকিত করে। লেখক ১৯০৫ এর আন্দোলনকে গল্পের সঙ্গে যুক্ত করে মৃণালের শক্তির বিস্ফোরণকে সত্য করে তুলেছেন। মৃণালের প্রতিবাদ ও বিদ্রোহ নিজের জন্য নয়, তার শ্বশুরবাড়িতে আশ্রিত অনাথ বালিকা বিন্দুর জন্য। আশ্রয়দাতাদের দুর্ব্যবহারে ভীত-সন্ত্রস্ত বিন্দুকে মৃণাল নিজের ঘরে নিয়ে আসলে, পরিবারের লোকেরা জোর করে পাগল বরে বিন্দুর বিয়ে দিয়ে দেয়। পরিণামে বিন্দুর কাপড়ে আগুন লেগে মৃত্যুর খবর পেয়ে মৃণালের ধৈর্যের বাঁধ ভেঙে যায়। সে অবলীলায় শ্বশুরবাড়ী পরিত্যাগ করে। সমস্ত প্রকার পারিবারিক এবং সামাজিক অত্যাচারের বিরুদ্ধে তার প্রত্যুত্তর তার স্বামীকে লেখা চিঠির মধ্যে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। যুক্তি ও শাণিত ভাষার দাপটে মৃণালের প্রবল ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য আর চাপা থাকে না। নারীর সামাজিক লাঞ্ছনার বিরুদ্ধে মৃণালের উক্তি—

"আমি আর তোমাদের সেই সাতাশ-নম্বর মাখন বড়ালের গলিতে ফিরব না। আমি বিন্দুকে দেখেছি। সংসারের মাঝখানে মেয়েমানুষের পরিচয়টা যে কী তা আমি পেয়েছি। আর আমার দরকার নেই।

তোমাদের অভ্যাসের অন্ধকারে আমাকে ঢেকে রেখে দিয়েছিলে। সেই মেয়েটাই তার আপনার মৃত্যু দিয়ে আমার আবরণমালা আগাগোড়া ছিন্ন করে দিয়ে গেল। আজ বাইরে এসে দেখি, আমার গৌরব রাখবার আর জায়গা নেই। আমার এই অনাদৃত রূপ যাঁর চোখে ভালো লেগেছে সেই সুন্দর সমস্ত আকাশ দিয়ে আমাকে চেয়ে দেখছেন। এইবার মরেছে মেজোবউ।"

১৩২১ সালে কার্তিক মাসে প্রকাশিত 'অপরিচিতা' গল্পের নায়িকা কল্যাণী পণপ্রথার শিকার। পণের গয়না জোগাড় ছিল ঠিকই কিন্তু পাত্রপক্ষের কর্তা গয়না যাচাই করার জন্য নিয়ে এসেছিল স্যাকরা, তাতেই কল্যাণীর বাবা বিয়ে ভেঙে দেয়। সেকালে মেয়েকে লগ্নভ্রষ্ট করার দুঃসাহস সবার ছিল না। বাবার কাছ থেকে মেয়ে পেয়েছিল মনের বল। তাই বিবাহভঙ্গের গ্লানি তাকে দুর্বলচিত্ত না করে আরও দৃঢ়প্রত্যয়নিষ্ঠ ও কর্মশীল করে তুলেছে। বিবাহের সার্থকতাই যে নারী জীবনের একমাত্র কাম্য নয়, তা কল্যাণী প্রমাণ করে দিয়েছে।

১৩২৪ সালে আষাঢ় মাসে প্রকাশিত 'পয়লা নম্বর' গল্পের নায়িকা অনিলা। একজন পতিব্রতা একনিষ্ঠ স্ত্রী হিসাবে স্বাভাবিক জীবনযাপন করলেও, অনিলার হৃদয় অগোচরে যে স্বামী-সংসার-বিমুখ চোরাবালির আবরণ ছিল তা বোঝা যায়। বাইরের পুরুষ সিতাংশুমৌলির প্রেমপত্রের অভিঘাতে সেই আবরণ খসে পড়ে, অনিলার এতদিনকার অনুকরণীয় জীবনের বিস্ফোরিত বিলোপন ঘটে তার হঠাৎ গৃহত্যাগে। সিতাংশুর লেখা

রোমান্টিক চিঠিগুলি অনিলাকে তার নিজের ভিতরকার নারীসত্তার খোঁজ দিয়েছিল। সে স্বামীর ঘর ছেড়ে চলে গেল। কিন্তু সিতাংশুর কাছেও গেল না। তবে প্রেমিকের চিঠিগুলির আয়নায় সে নিজেকে চিনল, জানল তারও আছে ব্যক্তিসত্তা।

বাদবাকি গল্পগুলি রবীন্দ্র-জীবনের শেষ পর্বে লেখা। 'তিনসঙ্গী' এর অন্তর্গত তিনটি গল্প (রবিবার, শেষকথা, ল্যাবরেটরী) পরে গল্পগুচ্ছ ৪র্থ খণ্ড নাম দিয়ে একটি বই বের করা হয়। তাতে বিশ্বভারতীর কর্তৃপক্ষ তিনসঙ্গীর গল্প তিনটি এবং আরও কয়েকটি গল্প সংগ্রহ করেন। আমাদের নির্বাচিত 'বদনাম' , 'মুসলমানীর গল্প' দুটি সেখান থেকেই সংগৃহীত করা হয়েছে। 'বদনাম' গল্পটি প্রকাশ পেয়েছিল ১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দের জুন মাসে। এই গল্পের নায়িকা সৌদামিনী স্বাদেশিকতার অনুগামী, তার ভাব-ভাবনা কর্ম সব মিশে আছে বিপ্লবী অনিলের সঙ্গে অথচ সে সরকারী পুলিশ অফিসারের স্ত্রী। সৌদামিনীর মধ্যে নিজের স্বামী ও গার্হস্থ্য বন্ধন ছিঁড়ে স্বাধীন হবার আকুলতা না থাকলেও নিজস্ব মত প্রকাশের স্বাধীনতা ছিল। সংসারে থেকে স্বামী ছাড়া অন্য কোন পুরুষের আদর্শকেও যে অধিক গুরুত্ব দেওয়া যায়, এবং প্রয়োজনে প্রাণও—তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ সৌদামিনী। সৌদামিনী প্রকৃতই একজন ব্যক্তিত্বময়ী নারী। স্বামী বিজয়ের প্রতি তার স্পষ্ট স্বীকারোক্তি—

"প্রাণপণে তোমার সেবা করেছি ভালোবেসে, প্রাণপণে তোমাকে বঞ্চনা করেছি কর্তব্যবোধে, এই তোমাকে জানিয়ে গেলুম।"

১৯৪১ খ্রীষ্টাব্দে জুন মাসেই প্রকাশ পায় 'মুসলমানীর গল্প' এই গল্পের নায়িকা কমলা হিন্দু রক্ষণশীলতার কবচ ছিঁড়ে ফেলে তার মুসলমান আশ্রয়দাতার পুত্রকে বেশ দৃঢ়তার সহিত বিবাহের প্রস্তাব দিয়েছে। তার স্পষ্ট স্বীকারোক্তি—

"যে দেবতা আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন সেই ভালোবাসার সম্মানের মধ্যে তাঁকেই আমি পূজো করি, তিনিই আমার দেবতা—তিনি হিন্দুও নন, মুসলমানও নন। তোমার মেজো ছেলে করিম, তাকে আমি মনের মধ্যে গ্রহণ করেছি—আমার ধর্ম কর্ম ওরই সঙ্গে বাঁধা পড়েছে। তুমি মুসলমান করে নাও আমাকে, তাতে আমার আপত্তি হবে না—আমার না হয় দুই ধর্মই থাকল।"

ইতিপূর্বে হিন্দু ধর্মের গোঁড়ামি ও রক্ষণশীলতার বিরুদ্ধে গোরা ও চতুরঙ্গের মতো একাধিক রচনায় রবীন্দ্রনাথ প্রচলিত সংস্কারবিমুখ ও দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ চরিত্র নির্মাণ করেছেন। ধর্মীয় আবেগকে নিষ্ঠার সহিত অনুসরণ করেছিল বলেই গোরার মনে হয়েছে—

"হিন্দুধর্ম মায়ের মতো নানাভাবে নানা মতের লোককে কোল দেবার চেষ্টা করেছে।" কিন্তু আবেগবিমুখ পরেশবাবুর মুখে প্রকাশ পেয়েছে অন্য কথা। তিনি বলেছেন—'হিন্দসমাজে প্রবেশ করবার পথ একেবারে বন্ধ'। তিনি আরও

বলেছেন—'হিন্দুসমাজ মানুষকে অপমান করে বর্জন করে'।[১] এরপর গোরাও যেদিন প্রকৃত সত্যের সন্ধান পেয়েছে, জানতে পেরেছে যে সে আইরিশ দম্পতির সন্তান, সেদিন উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেছে—

"আমি যা দিনরাত্রি হতে চাচ্ছিলুম অথচ হতে পারছিলুম না, আজ আমি তাই হয়েছি। আমি আজ ভারতবর্ষীয়। আমার মধ্যে হিন্দু মুসলমান-খৃষ্টান কোন সমাজের কোনো বিরোধ নেই। আজ এই ভারতবর্ষের সকলের জাতই আমার জাত। সকলের অন্নই আমার অন্ন।"

যে ধর্ম মানবিক কল্যাণবিমুখ, কু-সংস্কারাচ্ছন্ন-রবীন্দ্রনাথ সর্বত্রই তাকে উপেক্ষা করেছেন। পরাধীন ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমানের বিভেদকে মুছে ফেলার কথা তাঁর সৃষ্ট বিভিন্ন চরিত্রের সংলাপে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে। কিন্তু সাহিত্যসৃষ্ট সেই চরিত্রগুলি অধিকাংশই পুরুষ চরিত্র। কদাচিৎ কিছু কিছু নারী চরিত্রে মুখে রক্ষণশীল হিন্দু সমাজের বিরুদ্ধাচারণের শক্তি তাদের ব্যবহার ও ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে; সেই সব চরিত্রের মধ্যে অন্যতম মুসলমানীর গল্পের নায়িকা কমলা। হিন্দুর অস্পৃশ্যতাবোধের বিরুদ্ধে কমলা যে সাহসিকতা প্রদর্শন করে, তা একান্তভাবে কমলার ব্যক্তিসত্তার নির্ণায়ক। মুসলিম দস্যু দ্বারা তার খুড়তুতো বোন অপহৃত হলে পরিত্রাতা রূপে দেখা যায় বর্শা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকা এক রমণীকে—সে হল কমলা। সরলাকে উপলক্ষ্য করে তার উক্তি, এতকালের হিন্দু রক্ষণশীল সমাজের বিরুদ্ধে এক চরম ধিক্কার—

"বোন, তোর ভয় নেই। তোর জন্য আমি তাঁর আশ্রয় নিয়ে এসেছি যিনি সকলকে আশ্রয় দেন। যিনি কারও জাত বিচার করেন না।"

সর্বশেষে আলোচনা 'তিনসঙ্গী'র অন্তর্গত তিনটি গল্প বিষয়ে, যা কিনা গল্পকারের অনুভবের প্রগাঢ়তায় স্বতন্ত্র লালিত এবং যথার্থ নারী ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠা বন্দনায় মুখর। 'সবুজ পত্রের' যুগ হতেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর গল্পে নারী চরিত্রের যে মানসিক বিবর্তনের রূপরেখা আঁকতে চেয়েছিলেন, তারই সার্থক পরিণতি ধরা পড়ল তিনসঙ্গীর গল্প ত্রয়ীতে। পাঠক মহলে 'তিনসঙ্গী' সাধারণ অর্থে তিনটি গল্পের একত্র প্রকাশ; অথচ নিবিড় পর্যবেক্ষণে এর আক্ষরিক অর্থ ছাড়িয়ে ধরা দেয় এক গভীর অর্থ। ব্যক্তিত্বময়ী নায়িকা ত্রয়ী সামাজিক লিঙ্গ বৈষম্যকে ভেঙে দিয়ে তিনজন প্রতিভাবান পুরুষের যথার্থ 'সঙ্গী' হয়ে ওঠে—নামকরণের মধ্যে এই মূল সত্যটিই প্রকাশিত হয়েছে।

নারীবাদের প্রধান লড়াই লিঙ্গ-রাজনীতির বিরুদ্ধে। তুমি নারী, আমি পুরুষ এই বিভেদ মুছে ফেলা তখনই সম্ভব; যখন সব ধরনের সৃষ্টি প্রক্রিয়ার সমান দাবীদার করার থেকেও বেশি জরুরি প্রথানুসারী নারীসত্তার বিবর্তন। এই পরিবর্তনশীল নারীর দৃঢ় ব্যক্তিত্ব তিনটি পৃথক আঙ্গিকে রূপলাভ করেছে 'তিনসঙ্গী'র তিনটি গল্পে। লক্ষ্য করার

বিষয় হল, প্রতিটি গল্পেই নারীকে তিনজন গবেষক পুরুষের 'সঙ্গিনী' উল্লেখ করা হয়নি—বিভা, আচিরা, সোহিণী হয়ে উঠেছে তাদের পুরুষ সঙ্গীদের যথার্থ প্রতিসঙ্গী। লিঙ্গগত বিভেদ সত্ত্বেও 'তিনসঙ্গী' নামকরণের মধ্যে দিয়ে নারী-পুরুষ হয়ে উঠেছে একে অপরের পরিপূরক অথচ পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তিসত্তা। বিষয়টাকে একটা ছকের সাহায্য দেখানো যায়—

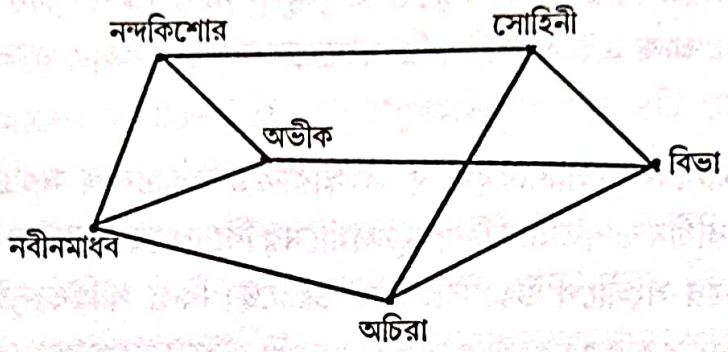

উল্লেখিত চিত্রে তিনজোড়া নারী-পুরুষ, ব্যক্তিত্ব বিচারের ক্ষেত্রে প্রত্যেকেই এক একটি স্বতন্ত্র মেরুতে অবস্থিত হয়েও একে অপরের সাথে সম্বন্ধযুক্ত। তিনসঙ্গীর অন্তর্গত তিনটি গল্পের স্বতন্ত্র বিচারে প্রবৃত্ত হলে এই বিষয়টি আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

'রবিবার' গল্পটি ১৩৪৬ সালের ২৫শে আশ্বিন শারদীয়া আনন্দবাজার পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এই গল্পের নায়ক চরিত্র অভীক; তার আকর্ষণীয় চরিত্রের তুলনায় নায়িকা বিভা ছিল ব্যক্তিত্বের জৌলুষে স্বাতন্ত্র্যধর্মী। ব্রাহ্মসমাজে মানুষ হয়ে পুরুষের সঙ্গে মেলামেশায় সংকোচ বিভার ছিল না। সে ছিল মনের দিক থেকে স্বাধীন এবং পুরুষতান্ত্রিক প্রভাব বহির্ভূত স্বয়ংসম্পূর্ণ ব্যক্তি। তার প্রতিটি ব্যবহার ও বক্তব্যের মধ্যে দিয়ে চারিত্রিক স্বাতন্ত্র্যের দিকটি প্রকট হয়ে ওঠে। নিজের প্রসঙ্গে নিজের তুলনায় অপরের মতামতে নিরপেক্ষতার দাবী বেশী; কারণ—অন্যের অনুভবে ব্যক্তি নিজেকে চিনতে পারে। তেমনি বিভা চরিত্রের স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধি করতে হলে বিভা সম্পর্কে অভীকের অভিমতকে গুরুত্ব দিয়ে বিচার করা প্রয়োজন। বিভা সম্পর্কে অভীকের অনুভূতি ক্রমান্বয়ে উদ্ধৃত করা হল—

"তোমার সৌন্দর্য ইতরজনের মিষ্টান্ন নয়। ও কেবল আর্টিষ্টের; লিওনার্ডো ডা ভিঞ্চির ছবির সঙ্গেই মেলে, ইনস্ক্রুটেবল্,"

"আশ্চর্য, তুমি আশ্চর্য আমি বলছি, তুমি আশ্চর্য। আমি তোমাকে দেখি আমার ভয় হয় কোন্‌দিন ফস করে মেনে বসব তোমার ভগবানকে।"

"তুমি লোভী নও, তোমার নিরাসক্ত মনের সবচেয়ে বড়ো দান স্বাধীনতা।"

"তোমার একটুখানি প্রশংসা আমার পক্ষে অমৃত। তোমার চরিত্রের অটল সত্য থেকে আমি অপরিমেয় দুঃখ পেয়েছি। তবু সেই সত্যকে দিয়েছি আমি বড়ো মূল্য।"

"এ কথা সত্য, মেয়েদের আমি ভালোবাসি।.....কিন্তু নিশ্চয় তুমি জান যে, তারা নীহারিকা মণ্ডলী, তার মাঝখানে তুমি একটিমাত্র ধ্রুবনক্ষত্র।"

"তোমার কাছ থেকে আজ দূরে এসে ভালোবাসার অভাবনীয়তা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে আমার মনের মধ্যে, যুক্তিতর্কের কাঁটার বেড়া পার করিয়ে দিয়েছে—আমাকে আমি দেখতে পাচ্ছি তোমাকে লোকাতীত মহিমায়।"

বিভার এমন কিছু অত্যাশ্চর্য সৌন্দর্য আছে যা আর্টিষ্টের কল্পনার মতো; সে নির্লোভী, নিরহঙ্কারী হওয়ার পাশাপাশি যথেষ্ট বুদ্ধিমতী। একমাত্র তারই প্রশংসা পাবার আশায় অভীক উদ্বেলিত। অভির তীব্র সকাম ভালোবাসাকে স্বীকার করেও সু-কঠোর বাক্‌চাতুর্যের দক্ষতায় বিভা তার প্রেমিককে বৃহত্তর কর্মের জগতে মুক্তি দিয়েছে। নারীর সমাজচিহ্নিত অবলম্বন সুনিশ্চিত করতে অভি নামক স্বামীত্বের শিলমোহর নিজের সর্বাঙ্গে বহন করে ফেরেনি সে, আর এখানেই বিভা একজন ব্যক্তিত্ববাদী মানুষ হয়ে উঠেছে। 'রবিবার' গল্পে বিভা চরিত্র পর্যালোচনা করলেই ব্যক্তিত্বময়ী নারীসত্তার পরিচয় পাওয়া সম্ভব।

সুশিক্ষিত, সুদর্শন একজন আর্টিষ্ট হওয়ার সুবাদে অতি সহজেই অন্যান্য নারীর সান্নিধ্য লাভ করে নেয় অভীককুমার; কিন্তু সে নিজে মনে মনে যার ঐকান্তিক সংস্পর্শ কামনা করে, তাকে কখনও অধিকারের শৃঙ্খলে বাঁধতে পারে না। বিভার জীবনে অভীককুমার সত্য হলেও প্রেমিকের জন্য কাঙালপনা সে করতে চায়না। এমনকি অভির তন্বী ছায়াসুন্দরী শীলার সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা শুনেও নিজের পছন্দের পুরুষের প্রতি বিভার উক্তি—

"এ জেলাসি নয়, এ অপমান। মেয়েদের নিয়ে তোমার এই গায়ে-পড়া সখ্য, এই অসভ্য অসংকোচ, এতে সমস্ত মেয়েজাতের প্রতি তোমার অশ্রদ্ধা প্রকাশ পায়। আমার ভালো লাগে না।"

শীলাকে কেন্দ্র করে নিজের ভোগ বাসনার কথা বলে, অভীক চেয়েছিলো বিভার মধ্যে নারীর ঈর্ষ্যাপরায়নতার রূপকে হতাশ করে দেওয়া, অভীককে স্বীকার করতে হল—

"না না না, কিছুতেই না। তোমারই কাছ থেকে সাহায্য নিয়ে শীলাকে আমি গাড়ি চড়িয়ে বেড়াব? এ প্রস্তাবে ধিক্কার দেবে এই ভেবেছিলুম, রাগ করবে এই ছিল আশা।"

সাংসারিক কর্তব্যের ভার বহনে বিভা সক্ষম, পাশাপাশি মানবিক দায়বদ্ধতার প্রয়োজনে নিজের সঞ্চিত অলংকার ও অর্থ বিসর্জন দিতেও বিভা নিঃসংকোচ। অধ্যাপক অমরবাবুর ম্যাথামেটিক্স কনফারেন্সে যোগদান করার সুযোগ আসায় বিভা নিজের অলংকার বিক্রি করে তাঁর বিদেশ যাবার বন্দোবস্ত করেছে। অলংকার নারীর কাছে

প্রাণস্বরূপ হলেও বিভা মনে করে—

"গয়নাগুলো মা দিয়ে গেছেন আমার ভাবী বিবাহের যৌতুক। বিবাহটা বাদ দিলে ও গয়নার কী সংজ্ঞা দেব। যাই হোক, কোন শুভ কিংবা অশুভ লগ্নে এই কন্যাটির সালংকারা মূর্তি আশা কোরো না।"

বিভার মাতা-পিতার মৃত্যুর পর সংসারের দায়িত্ব আত্মীয়পক্ষে হালকা ছিল বলেই অনাত্মীয়পক্ষে তা হয়েছে বহুবিস্তৃত। আপনাগড়া সংসারের কাজ একা নিজের হাতে নিষ্পন্ন করেও অতিরিক্ত সময়ে সে গণিতবিদ্যা শিখতো, আর ছোট ছেলেমেয়েদের পড়াতো। এককথায় অযাচিত দায়িত্বের ভার বহন করায় বিভা ছিল সিদ্ধহস্ত। নিজের সংসার না হলেও বিভা যে সাংসারিক কর্তব্য পালন করতো, তা আসলে একপ্রকার সামাজিক দায়বদ্ধতা। পিতা-মাতাহীন কুমারী যুবতী নারী হয়েও বিভা অভীককুমারের প্রেম যমুনায় ভেসে যেতে চায়নি। উপরন্তু প্রেমতাপে জর্জরিত অভীকের বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাসকে নিঃস্বার্থে আলোর দিশা দেখিয়েছে। অভীকের প্রতি একনিষ্ঠ ভালোবাসা বিভার ছিলো, কিন্তু ভালোবাসার মাত্রাধিক্য আবেগে ভেসে না গিয়ে সে বলেছে—

"বিশ্বহিত নয় গো, কোন একজন অতি সুস্থ হতভাগাকে ভুলে থাকবার জন্যেই এত করে কাজ বানাতে হয়। এখন ছাড়ো, আমি যাই....।"

অভীক যে যথার্থই প্রতিভাবান শিল্পী, তাকে শিল্পের সাধনায় সব বাঁধনকে ছিন্ন করে এগিয়ে যেতে হবে—এই ধ্রুব সত্যটিকে বিভা উপলব্ধি করেছিলো। প্রেমিককে স্বীকার করতে গিয়ে একজন আর্টিষ্টকে একঘেঁয়ে সংসার জীবনে বেঁধে ফেলতে চায়নি বিভা। কিন্তু অভীককে অস্বীকার করার জন্য তাকে নিভৃতে চোখের জল ফেলতে হয়েছে—

"অভীকের সমস্ত ছেলেমানুষি, ওর অবিবেচনা, ওর আবদার, যতই মনে পড়তে লাগল ওর দুই চক্ষু বেয়ে, কেবলই নিজেকে পাষাণী বলে ধিক্‌কার দিলে।"

বৃহত্তর জীবনের স্বার্থে ক্ষুদ্র জীবনের সব চাহিদাকে তুচ্ছ করার মানসিকতা বিভাকে শেষপর্যন্ত প্রথাবিরুদ্ধ ব্যক্তিত্বময়ী নারীর মর্যাদা দান করেছে। গল্পের শেষ পরিচ্ছেদে বিভা সম্পর্কে অভীকের উপলব্ধি—

"তোমার কাছ থেকে আজ দূরে এসে ভালোবাসার অভাবনীয়তা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে আমার মনের মধ্যে, যুক্তিতর্কের কাঁটার বেড়া পার করিয়ে দিয়েছে আমাকে—আমি দেখতে পাচ্ছি তোমাকে লোকাতীত মহিমায়। এতদিন বুঝতে চেয়েছিলুম বুদ্ধি দিয়ে, এবার পেতে চাই আমার সমস্তকে দিয়ে।"

'শেষকথা' প্রকাশিত হয় ১৩৪৬ বঙ্গাব্দের ফাল্গুন মাসে 'শনিবারের চিঠি'তে। এই গল্পের নায়ক নবীনমাধব দেশের আঁচলধরা বুড়ো খোকাদের দলে মিশে মা মা ধ্বনিতে

মন্ত্র পড়ার থেকে অশিক্ষিত হতদরিদ্র দেশবাসীর জন্য গৃহস্থের শৃঙ্খল ত্যাগ করাকেই জীবনের একমাত্র ব্রত বলে মনে করে। দেশের কর্মযজ্ঞে যৌবনের সকল বাসনাকে যে অবলীলায় পরিত্যাগ করে বিদেশ যায় খনিজবিদ্যা শিখতে। তার সৃষ্টিশীল মন আর মস্তিষ্কের অনুসন্ধিৎসায় জীবনের অন্য সবকিছু তুচ্ছ হয়ে পড়ে।

"যৌবনের গোড়ার দিকে নারীপ্রভাবের ম্যাগ্‌নেটিজ্‌মে জীবনের মেরুপ্রদেশের আকাশে যখন অরোরার রঙিন ছটার আন্দোলন ঘটতে থাকে, তখন আমি ছিলুম অন্যমনস্ক। আমি সন্ন্যাসী, আমি কর্মযোগী—এই সব বাণীর দ্বারা মনের আগল শক্ত করে আঁটা ছিল।"

নবীনমাধবের কঠিন ব্রতসাধনার মাঝে হঠাৎ এক প্রেমাহত নারীর আবির্ভাব ঘটল। প্রথমে নবীনমাধব বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেল, তারপর অনুভব করল—

"যে আঘাতে মানুষের নিজের অজানা একটা অপূর্ব স্বরূপ ছিটকিনি খুলে অবারিত হয়, সেই আঘাত আমাকে লাগল কী করে। বরাবর জানি, আমি পাহাড়ের মতো খট্‌খটে, নিরেট। ভিতর থেকে উছলে পড়ল ঝরনা।"

গবেষক সন্ধানী দৃষ্টি যাকে দেখে মুহূর্তে স্থির হয়ে গেল, সে একজন নারী, কিন্তু অসামান্যা—নবীনমাধব তার নাম দিলো 'অচিরা'।

গল্পের স্বার্থে অচিরা শব্দের অর্থ বলা হয়েছে—যার প্রকাশ হতে বিলম্ব হল না, বিদ্যুতের মতো। জীবনের উদ্দামতা আর সহজ প্রাণের আনন্দে মাতোয়ারা যুবতী অচিরা। তার মধ্যে এক সহজাত ভালো মানুষ ছিলো। ধৈর্য্য, বুদ্ধি, কর্তব্য, কঠোরতায় অচিরা হয়ে উঠেছিল বৃদ্ধ অধ্যাপকের একমাত্র ছায়াসঙ্গী। ছোটবেলায় পিতা-মাতার মৃত্যুর পর দাদু-নাতনী ছিলো একে অপরের পরম সহায়। তাদের ভালোবাসার ভাবের ঘরে সিধ কেটে নিজের প্রতিষ্ঠার পথ সুগম করেছিলো ভবতোষ। অচিরাকে বিয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে তার অধ্যাপক দাদুর কাছ থেকে বিদেশে স্কলারশিপ্‌এর খরচ যোগাড় করেছিল যে ছেলে, সে দেশে ফিরে অতি সহজেই ভারত সরকারের উচ্চপদস্থ মুরুব্বির মেয়েকে বিয়ে করায় অচিরার প্রেমতরী অকালে মুখ থুবড়ে পড়ল। মারাত্মক দুঃখ, অভিমান ও লজ্জায় দাদু-নাতনী তাদের বাড়ি ছেড়ে বনাঞ্চলের নির্জনে চলে আসল। প্রকৃতির উদারতায় তারা সাময়িক ধাতস্থ হয়েছিলো, অচিরা বুঝেছিলো পুরুষের ভালোবাসা মোহজাল মাত্র। ব্যর্থ প্রেমের অভিজ্ঞতাই অচিরাকে পরিণত একক ব্যক্তি নারী হতে সাহায্য করেছিলো। এই ঘা-খাওয়া নারীর মজ্জায় মজ্জায় যে ব্যক্তিত্বের উর্বরতা, সেখান থেকেই জীবনের উপাদান খুঁজে পেয়ে একনিষ্ঠ গবেষক নবীনমাধবের জীবনে সব বন্ধ দুয়ার খুলে গেল।

সরাসরি পরিচয়ের পর্বে অচিরার কোন পরিচয় না পেয়ে নবীনমাধবের মনে

হয়েছিলো—

"অচিরার কোন পরিচয় না পেয়েই মনে হল,ও আর এক জাতের—এ কালের বাইরে আছে দাঁড়িয়ে নির্মল আত্মমর্যাদায়, স্পর্শভীরু মেয়ে।"

এরপর বনের নির্জন পথে সামান্য আছিলায় অচিরার সাথে কথা বলে, তার সান্নিধ্য পাবার বাসনায় উদাগ্র হয়ে পড়ল নবীনমাধব। তীক্ষ্ণ বুদ্ধির সংস্পর্শে অচিরা সহজেই বুঝতে পারল, বিজ্ঞান-সাধকের সাধনার একনিষ্ঠতায় বাধা ফেলছে মোহান্ধ প্রেমের উর্দ্ধগতি। প্রথমবার প্রেমে প্রত্যাখ্যাত হয়ে অচিরা এটা বুঝেছিলো ইমপার্সোনাল না হলে প্রেমের ভাবাবেগে ব্যক্তির নিজস্বতা ক্ষুন্ন হয়। প্রেমে প্রত্যাখ্যাত হয়েই অচিরা পেয়েছে ব্যক্তিজীবনে ইমপার্সোনাল ভালোবাসার সন্ধান। নবীনমাধবকেও অচিরা দিতে চায় প্রেমের সেই ইমপার্সোনাল উপলব্ধি—

"আপনাদের সম্পদ জ্ঞানের—উচ্চতম শিখরে সে জ্ঞান ইম্পার্সোনাল। মেয়েদের সম্পদ হৃদয়ের, যদি তার সব হারায়— যা কিছু বাহ্যিক, যা দেখা যায়, ছোঁয়া যায়, ভোগ করা যায়, তবু বাকি থাকে সেই ভালোবাসার আদর্শ যা অবাঙ্‌মনসোগোচর।"

শক্তিশালী স্বদেশ গঠনের স্বার্থে ব্যক্তিগত স্বার্থ যেন বাধার সৃষ্টি না করে, সেজন্য নবীনমাধবকে উদ্দ্যেশ্য করে অচিরা বলে—

"আমার সঙ্গে আপনার পরিচয় যতই এগিয়ে চলল, ততই দুর্বল হল সেই সাধনা। নানা তুচ্ছ উপলক্ষে কাজে বাধা পড়তে লাগল। তখন ভয় হল নিজেকে এই নারীকে।"

নারীর কাছে পুরুষের ভালোবাসা একপ্রকার নির্ভরতার আশ্বাস। নারী চায় সেই আশ্রয়কে আঁকড়ে ধরে রাখতে, কখনোই নিজে থেকে তাকে দূরে ঠেলে দেয় না। কিন্তু বৃহত্তর আদর্শের স্বার্থে অচিরা প্রথাগত নারীভাবনা থেকে দূরে সরে এসেছে। তার স্পষ্ট স্বীকারোক্তি—

"আমি তোমাকে টেনে এনেছি তোমার আসন থেকে নীচে। আমরা কেবল নামিয়ে আনতেই আছি।"

কিছুদিনের নির্জন নির্বাসন আর বনের মদিরতায় অচিরা নিজেকে নতুন করে জেনেছে। ব্যক্তিগত সুখসন্ধানের থেকেও তার কাছে দাদুকে সঙ্গ দানের প্রয়োজনটাই বেশি প্রয়োজনীয় বলে মনে হয়েছে। অধ্যাপক অমরনাথবাবু হয়তো ভেবেছিলেন তার নাতনি এখানকার রোদ-ছায়া ঘেরা নির্জনতায় এসে নতুন করে পুরুষের প্রেমে পড়েছে। তাই নবীনমাধবকে অচিরার সাথে বিবাহ সম্বন্ধে আবদ্ধ করার নিরন্তর প্রচেষ্টা করে গেছে। শেষ পর্যায়ে অচিরার দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ সংলাপ শোনার পরেও তিনি নবীনমাধবকে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন—

"জান নবীন, এইরকম যা-তা বলবার উপসর্গ ওর সম্প্রতি দেখা দিয়েছে।

সব লক্ষণ শান্ত হয়ে যাবে, তুমি চলো দেখি তোমার কাজে। নাড়ি আবার ফিরে আসবে। থামবে প্রলাপ বকুনি।"

অবশেষে সবকিছুকে ছাপিয়ে বড় হয়ে উঠেছে অচিরার ব্যক্তিগত মত প্রকাশের স্বাধীনতা আর প্রথাসিদ্ধ পুরুষতান্ত্রিক কর্তৃত্বকে উপেক্ষা করার প্রবল মানসিকতা। প্রেমিক পুরুষের আকর্ষণ আর দাদুর বিবাহ প্রস্তাবকে একযোগে অস্বীকার করে অচিরা আচমকা নবীনমাধবের পা ছুঁয়ে প্রণাম করে বললো—

"সংকোচ করবেন না, আপনার তুলনায় আমি কেউ নই। সে কথাটা একদিন স্পষ্ট হবে। এইখানেই শেষ বিদায় নিলুম। যাবার আগে আর কিন্তু দেখা হবে না।"

নবীনমাধবের প্রতি অচিরার শেষ উক্তিতে নারীর কোমল স্বভাবচিহ্নিত রূপ মুছে গিয়ে প্রকাশ পেয়েছে এক তীব্র ব্যক্তিত্বের ঝলকানি। তাই গল্পের শেষে জিয়লজিষ্ট নবীনমাধবের অনুভব হ'ল—

"মনে হঠাৎ খুব একটা আনন্দ জাগল—বুঝলুম একেই বলে মুক্তি। সন্ধ্যাবেলায় দিনের কাজ শেষ করে বারান্দায় এসে বোধ হল—খাঁচা থেকে বেরিয়ে এসেছে পাখি, কিন্তু পায়ে আছে এক টুকরো শিকল। নড়তে চড়তে সেটা বাজে।"

নবীনমাধব এতদিন প্রেমের ঘোরে ডুবে ছিলো, ইতিপূর্বে অচিরা যেমন ছিলো ভবতোষকে কেন্দ্র করে। প্রেমের ঘোর কেটে যাবার পর, অচিরা সন্ধান পেলো তার ইমপার্সোনাল ভালোবাসার অনুভূতিকে; সেই ভালোবাসার বীজমন্ত্র ছড়িয়ে দিলো নবীনমাধবের মধ্যেও, সেও অনুভব করলো—

"বুঝলুম একেই বলে মুক্তি"

রবীন্দ্রসৃষ্ট ছোটগল্পে নারীচরিত্রগুলির মধ্যে একমাত্র সোহিনী পুরোমাত্রায় আধুনিক এবং যথার্থ ব্যক্তিত্বশালী মানুষ রূপে গণ্য হবার যোগ্য। ইতিপূর্বে উল্লেখিত অন্যান্য সব গল্পের নারীরা নীতিবাদিতা বিচারে সমান প্রদর্শিত পথেই হেঁটেছে। নারীর ক্ষেত্রে একাধিক পুরুষের সান্নিধ্য কোনও গল্পের শেষে সফল পরিণতি পায়নি, কিন্তু 'ল্যাবরেটরী' গল্পে সোহিনী এমন একজন নারী, যে পুরুষ সঙ্গী নির্বাচনের ক্ষেত্রে বারংবার সমাজের উর্দ্ধে নিজের ব্যক্তি মতকে গ্রহণযোগ্য মনে করেছে। সোহিনী তার লিঙ্গ ও যৌন পরিচয় সম্পর্কে সচেতন হয়েই যৌন স্বাধীনতাকে নিজের ইচ্ছা অনুযায়ী ব্যবহার করেছে। প্রবন্ধের সূচনায় যেকথা বলা হয়েছিলো—ভারতীয় নারীদের জীবনে লিঙ্গ সমস্যার সাথে জড়িত থাকে ঔপনিবেশিকতা, বিত্ত, বর্ণ মিশ্রিত এক বিচিত্র জটিল সমাজ নির্ভরতা—তাকে কাটিয়ে উঠেছে সোহিনী।

নারীর ব্যক্তিত্ব নির্মাণের প্রধান অন্তরায় তার যৌন পরিচয় (Sex Identity)। সোহিনী সেই পরিচয় ভেঙে বেরিয়ে আসতে পেরেছে বলেই যৌনতার মোহ তাকে সর্বনাশের দিকে ঠেলে দিতে পারেনি। পুরুষের বুদ্ধি, অর্থ, সম্মান ও বাহুবল তার সাফল্যের মূল সম্পদ; সোহিনী নিজ গুণে সেই সম্পদের অধিকারী হয়েছে। নারী তার যে দিকটায় দুর্বল সেটা তার মন ও শরীরের গঠন নয়; এর জন্য দায়ী ব্যক্তিত্বহীনতা আর মনের জোরের অভাব। রবীন্দ্রনাথ সোহিনী চরিত্র নির্মাণ করে সচেতনভাবে এই ভুল ভেঙে দিতে পেরেছেন, এটাই 'ল্যাবরেটরী' গল্পের কাছে আমাদের বড় পাওনা।

নারীর কাছে যৌন ও লিঙ্গ পরিচয়ের বাধা কাটিয়ে ওঠা একেবারেই সহজ ব্যাপার নয়। কার্যক্ষেত্রে লিঙ্গ সাম্যের সদিচ্ছা পরিণত হয় যৌন স্বাধীনতায়, এরপর যৌন স্বাধীনতার বাসনা নারীকে তার ব্যক্তিপরিচয় লুপ্ত করে পুনরায় নিক্ষেপ করে পুরুষতান্ত্রিক কারাগারে। সেক্ষেত্রে নারী হয়ে ওঠে পুরুষের ভোগ্য বস্তু। কখনও অর্থের বিনিময়ে, কখনও বাহুবলের বিনিময়ে, নারীরা ক্রমাগত পুরুষের প্রেমহীন ভোগবাসনার তীরে বিদ্ধ হয়। সোহিনীর একমাত্র মেয়ে নীলাও এই পথের পথিক হয়ে পড়েছিলো। কিন্তু সূক্ষ্মভাবে বিচার করলে সোহিনীর মধ্যে এইসব ধারণার পরিপন্থী এক অনন্য সাধারণ ব্যক্তিত্ব মহিমা পরিলক্ষিত হয়। সোহিনীর সমস্ত প্রকার কর্মের পেছনে একটাই মূল উদ্দেশ্য ছিল—প্রকৃত প্রতিভার অন্বেষণ। সেই নির্ধারিত লক্ষ্যে পৌঁছানোর জন্যে তাকে অবলীলায় ভেঙে ফেলতে হয়েছে সমাজ নির্ধারিত লিঙ্গ-রাজনীতির বাঁধনকে। নিজে কী করছি সেটা না জেনে নয়, কী করলে ইপ্সিতকে পাওয়া যাবে—সেটাই বড় কথা। কোনওপ্রকার দৌর্বল্য ও দারিদ্র্য সোহিণীর ইপ্সিত লক্ষ্যের অন্তরায় হতে পারেনি। কারণ অদম্য সাহস আর জেদের ওপর ভর করে একজন সামান্যা নারী থেকে সোহিনী হয়ে উঠেছে নন্দকিশোরের বিজ্ঞান সাধনার সঙ্গিনী। সমাজের দায় বহনকারী অধ্যাপককেও তাই স্বীকার করতে হয়েছে—

"খনি থেকে সোনা ওঠে, সে খাঁটি সোনা, যদিও তাতে মিশেল থাকে অনেক-কিছু। তুমি সেই ছদ্মবেশী সোনার ঢেলা।"

বিশ বছরের সোহিনী প্রথম পরিচয়ে যে পুরুষটির কাছে নিজের দুর্বলতার কথা অকপটে স্বীকার করেছিল সে একজন প্রতিভাবান এঞ্জিনিয়ার—তার নাম নন্দকিশোর। সোহিনীর এই গায়ে পড়া সখ্যে সমাজ কিছু মনে করলেও, তার কিছু যায়-আসে না। চারিত্রিক ন্যায়-অন্যায়ের মানদণ্ড নিজের হাতে ছিলো বলেই সোহিনী প্রথম পরিচয়েই বলতে পেরেছিলো—

"বাবু, রাগ কোরো না, তোমার মধ্যে ঐ শয়তানের মন্তর আছে। তাই তোমারই হবে জিত। অনেক পুরুষকেই আমি ভুলিয়েছি, কিন্তু আমার উপরেও টেক্কা দিতে পারে

এমন পুরুষ আজ দেখলুম। আমাকে তুমি ছেড়ো না বাবু, তা হলে তুমি ঠকবে।"

লোক চিনতে সোহিনী কোনও ভুল করেনি। কারণ এই নন্দকিশোরের মাধ্যমেই পরিবর্তিত হতে শুরু করলো সোহিনীর জীবনধারা (Standard of Life)। নন্দকিশোরের দেওয়া অর্থে সোহিনী দেশে দেনার দায় থেকে মুক্ত হল, একজন স্ব-প্রতিষ্ঠিত পুরুষকে সঙ্গী হিসাবে পেল, তার সহচর্যে যথার্থ বিদ্যাশিক্ষা লাভ করল, অবশেষে নন্দকিশোরের অবর্তমানে বিপুল অর্থ ও সম্মানের অধিকার পেল।

সাধারণ একটি মেয়ে হঠাৎ করে বিশাল সম্পদ ও অর্থের অধিকারী হয়ে উঠলে যতটা বিস্মিত হতে পারে সোহিনীর মধ্যে বিন্দুমাত্র সেই লক্ষণ দেখা গেলনা। দুঃসাহসিক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করতে গিয়ে অপঘাতে নন্দকিশোরের মৃত্যুর পর সোহিনী অত্যধিক সচেতন হয়ে পড়ল। কারণ,

"বিধবা মেয়েদের ঠকিয়ে খাবার ব্যবসাদার এসে পড়ল চার দিক থেকে। মামলার ফাঁদে ফাঁদলে আত্মীয়তার ছিটেফোঁটা আছে যাদের। সোহিনী স্বয়ং সমস্ত আইনের প্যাঁচ নিতে লাগল বুঝে। তার উপরে নারীর মোহজাল বিস্তার করে দিলে স্থান বুঝে উকিলপাড়ায়। সেটাতে তার অসংকোচ নৈপুণ্য ছিল, সংস্কার মানার কোনো বালাই ছিল না। মামলায় জিতে নিলে একে একে, দূর সম্পর্কের দেওর গেল জেলে দলিল জাল করার অপরাধে।"

এই পর্বে বিধবা সোহিনী আরও পরিণত, পূর্বের তুলনায় তীক্ষ্ণ ব্যক্তিত্বময়ী নারী রূপে উপস্থাপিত হয়েছে। স্বামীর মৃত্যুতে গভীর শোক-বিহ্বলতায় ডুবে না গিয়ে সোহিনী মণে প্রাণে চেয়েছে তার অসমাপ্ত কাজের পরিপূর্ণ রূপায়ণ। পাশাপাশি তার একমাত্র মেয়েকে সৎপাত্রে সমর্পণ করার গুরুদায়িত্বও ছিল সোহিনীর নিঃসঙ্গ কাঁধে। ক্ষুরধার মস্তিষ্কের অধিকারী হওয়ার সুবাদে উভয় দায়িত্বকে একত্র সমাধানের একটা সুন্দর পথও খুঁজে বার করেছিলো সে। ভেবেছিলো তরুণ গবেষক রেবতীকে স্বামীর স্বপ্নের ল্যাবরেটরী আর নীলার দ্বায়িত্ব একসাথে অর্পণ করে সে নিশ্চিন্ত হবে। কিন্তু রেবতী-নীলার ব্যক্তিজীবনের অদূরদর্শিতায় তা সম্ভব হয়নি। প্রতিটি মানুষ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে ভিন্ন বলেই সোহিণী বুদ্ধিমত্তায় আর সকলের থেকে একেবারে আলাদা। সে জানে পুরুষের কাছে নারীর রূপ সৌন্দর্যের আকর্ষণ তাৎক্ষণিক; তা সক্রিয় থাকা অবস্থায় নিজের ঘর গোছাতে হয় নারীকে। সোহিনী ঠিক সময় মতন সেই তাৎক্ষণিকতার সুযোগ নিয়েছে। স্বামীর গবেষণাগারে যারা কাজ শিখতে আসত তাদের সাথে যৌবনের চাঞ্চল্য মিশ্রিত ভাব বিনিময়, সম্পত্তির মামলার সময় উকিল ও আর্টিকেল্‌ড্ ক্লার্ককে সন্তুষ্ট করে কোর্টে নিরঙ্কুশ জয় আদায় করা, রেবতীকে নিজের ল্যাবরেটরীতে নিয়ে আসার জন্য অধ্যাপক মন্মথ চৌধুরীকে ব্যবহার করা প্রভৃতি সব কাজেই সোহিনী সমান পারদর্শী। এই বিষয়ে

তার অকপট স্বীকারোক্তি—

"গ্রহগুলো টান মেনে চলে আবার টান এড়িয়ে চলে—এটা শিখে নেবার তত্ত্ব বৈকি।"

সোহিনীর সবচেয়ে বড়ো গুণ স্পষ্টবাদিতা; একাধিক পুরুষের সাথে আচমকিত সম্পর্কে জড়িত হলেও তা কখনোই স্বামীর মহত্ত্বকে ক্ষুণ্ণ করেনি বলে অধ্যাপক চৌধুরীকে সোহিনী বলতে পেরেছে—

"গায়ে আমার দাগ লেগেছে কিন্তু মনে ছাপ লাগেনি। কিছু আমাকে আঁকড়ে ধরতে পারেনি। যাই হোক, তিনি যাবার পথে তাঁর চিতার আগুনে আমার আসক্তিতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছেন, জমা পাপ একে একে জ্বলে যাচ্ছে। এই ল্যাবরেটরীতেই জ্বলছে সেই হোমের আগুন।"

বলাবাহুল্য এই প্রবল ব্যক্তিগত বোধ সোহিনীকে সকলপ্রকার পাপবোধের উর্দ্ধে যথার্থ আধুনিক নারীর মর্যাদা দান করেছে। সোহিনীর কাছে পুরুষের ম্যাগনেটিজম্‌টাই আসল, যৌবনোন্মত্ত নারীকে যা প্রবলভাবে আকর্ষিত করে। নিজের প্রথম যৌবনের রসোন্মত্ততার ইতিহাস কল্পনা করে সে নিশ্চিত ছিলো, একদিন নীলার জীবনেও সেই অনিবার্য আলোড়ন শুরু হবে। কিন্তু ভয় ছিলো নিজের মেয়েকেই, কারণ বাস্তব বিচারে সোহিনী বুঝেছিলো—বাইরের পুরুষ তার বিপুল সম্পত্তির লোভে ধেয়ে আসবে নীলার কাছে; আর তার মেয়ে ঐটাতেই রূপের গর্ব মনে করে উদ্ধত ব্যাভিচারিণী হয়ে উঠবে?

সোহিনীর দূরদর্শিতা এতো সুদূরপ্রসারী ছিলো যে, মেয়ের সাথে তার ভবিষ্যত প্রতিদ্বন্দ্বিতা আঁচ করতে কোনও অসুবিধা হয়নি। ল্যাবরেটরীর বিজ্ঞান সাধনার দায়িত্ব রেবতীর হাতে দিয়েও তাই নিশ্চিন্ত হতে পারেনি সোহিনী। নবম পরিচ্ছেদের সূচনায় সোহিনীর উক্তি—

"চৌধুরীমশায়, আর সবই চলছে ভালো কেবল আমার মেয়ের ভাবনায় সুস্থির হতে পারছি নে। ও যে কোন দিকে তাক করতে শুরু করেছে বুঝতে পারছি নে।"

ঝড়ের অভিঘাত যেভাবেই আসুক তার জন্য আগাম প্রস্তুতি নিয়ে রেখেছে সোহিনী। তাই নিজের মেয়েকে উপলক্ষ্য করে তাকে বলতে শুনি—

" রাজকন্যাটি মাটির দরে বিকোবে তা জানি, কিন্তু আমি বেঁচে থাকতে রাজত্ব সস্তায় বিকোবে না। "

সোহিনীর কাছে মেয়ের থেকেও দামী যে রাজত্ব, তা কোন অর্থ ও ক্ষমতার দম্ভ নয় — তা নন্দকিশোরের গবেষণাগার, সৃষ্টির উন্নতমানের কারখানাঘর, বিজ্ঞানের ল্যাবরেটরী। নিজের প্রাণ দিয়ে বা অন্যের প্রাণ নিয়ে হলেও এই গবেষণাগারকে রক্ষা করতে চায় সোহিনী। যার প্ররোচনায় নীলা এই সাধনবেদী কলুষিত করতে চায় সেইসব

অশুভ শক্তির প্রতি সোহিনী খড়্গহস্ত, এমনকি নিজের মেয়েও এর উর্দ্ধে নয়। পাঞ্জাবে যাওয়ার আগে তাই নীলাকে উদ্দেশ্য করে সোহিনী বলে যায়—

"তোমার বঙ্কুবাবুকে আমি সিধে করে দেব যদি আমার সীমানায় তিনি পা বাড়ান। আইনে না পারি বে আইনে। ..... " বলে নিজের কোমরবন্ধ থেকে ছুরি বের করে বললে, "এ ছুরি না চেনে আমার মেয়েকে, না চেনে আমার মেয়ের সোলিসিটরকে। এর স্মৃতি রইল তোমার জিম্মায়। ফিরে এসে যদি হিসেব নেবার সময় হয় তো হিসেব নেব।"

লেখক প্রকৃত আধুনিক নারীসত্তার সচেতন অনুসন্ধানের লক্ষ্যে, সোহিনীর বিপরীতে নীলাকে সৃষ্টি করেছেন। সোহিনী আর নীলা এই দুজনে মা ও মেয়ে। উভয়েই নারী হলেও— একজন সৃষ্টিকামী, অন্যজন ধ্বংসকামী। যদিও উভয়ের মধ্যেই প্রচলিত নারীসত্তার বিপরীতে যৌবনরসোন্মত্ত দুঃসাহসিকতার পরিচয় প্রতিফলিত হয়েছে, এবং সেক্ষেত্রে যৌন পরিচয়বিধি ভেঙে ফেলার প্রচেষ্টাও বিদ্যমান। তবে এই গল্পের সবচেয়ে যেটা আশ্চর্যের বিষয় সেটি হল—লিঙ্গ বা যৌন পরিচয়ের উর্দ্ধে স্থান পেয়েছে ব্যক্তিত্বের ধারণা। মানুষের ব্যক্তিত্ব পরিচায়ক বৈশিষ্ট্যগুলি অবশ্যই নেতিবাচক নয়; তা ইতিবাচক। মহত্তর সৃষ্টি প্রক্রিয়ার কাছে ব্যক্তিগত সব চাওয়া-পাওয়া তুচ্ছ হয়ে পড়ে। সেই জন্যই মা ও মেয়ের (সোহিনী ও নীলা) একাধিক পুরুষের সাথে গায়ে পড়া সখ্য, স্পর্শ, উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতার প্রসঙ্গ বর্ণনা ফিকে হয়ে গিয়ে আলোচ্য গল্পে প্রাধান্য পায় ল্যাবরেটরী নির্মাণ প্রসঙ্গটি। বিদ্যা-বুদ্ধি-বিজ্ঞানসাধনার আঁতুড়ঘর এই ল্যাবরেটরী। এখানকার সাধনা কঠোর ব্রত পালনের—ভোগ-সুখের ঠুনকো স্পর্শে ল্যাবরেটরীর স্বপ্ন ভেঙে যাবে না। সোহিনী এর রক্ষাকর্তা, কিন্তু নীলা একে ধ্বংস করতে উদ্দ্যোগী। নিজের একমাত্র মেয়ে জাগানী ক্লাব স্থাপন করে, তাদের সদস্য দলে রেবতীকে নিয়ে এসে, অন্যের প্ররোচনায় সোহিনীর সম্পত্তি হস্তগত করার নিকৃষ্ট ষড়যন্ত্র করলে, মাতৃত্বের পেলবতার পরিধি ভেঙে দিয়ে দৃপ্ত পৌরুষের স্বরে মেয়েকে সচেতন করেছে—

"আসল সন্দেহের মূল আরো অনেক আগেকার দিনের। কে তোর বাপ, কার সম্পত্তির শেয়ার চাস। এমন লোকের তুই মেয়ে ও কথা মুখে আনতে তোর লজ্জা করে না।"

গল্পের শেষে নীলার যথার্থ পিতৃপরিচয় দানে সোহিনীর মাথা হেঁট হয়ে যায়নি, বরং—নন্দকিশোরের কঠিন ব্রতের যোগ্য অনুসরণকারিণী হতে পেরে সোহিনী হয়ে উঠেছে যথার্থ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন আধুনিক নারী। রবীন্দ্রকৃত ছোটগল্পের ধারায়, সোহিনী তাই ব্যক্তিত্বময়ী নারী চরিত্রের চরম বিবর্তিত রূপ— এমনটা আজ আর অস্বীকার করা যায় না।

তথ্যসূচি:

(ক) 'গল্পগুচ্ছে' (প্রথম খণ্ড), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী সংস্করণ, আষাঢ়, ১৪০৩,

(খ) 'গল্পগুচ্ছ' (দ্বিতীয় খণ্ড), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী সংস্করণ, শ্রাবণ, ১৪০৪,

(গ) 'রবীন্দ্র-রচনাবলী' (ত্রয়োদশ খণ্ড), রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১২৫তম রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ, পৌষ ১৪১০,

(ঘ) 'নারী', হুমায়ুন আজাদ, তৃতীয় সংস্করণ চতুর্দশ মুদ্রণ, অগ্রহায়ণ ১৪১৪, ডিসেম্বর ২০০৭,

(ঙ) 'রবীন্দ্র ছোটগল্পের শিল্পরূপ', তপোব্রত ঘোষ, তৃতীয় সংশোধিত পুনর্মুদ্রণ, বাইশে শ্রাবণ ১৪১০,

(চ) 'ঠাকুর বাড়ির অন্দরমহল', চিত্রা দেব, দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৯৮০,

(ছ) 'নারী প্রগতি ঃ আধুনিকতার অভিঘাতে বঙ্গরমণী', গোলাম মুরশিদ, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারী ২০০১,

(জ) 'বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগ ঃ নারীবাদী পাঠ', অপু দাস, প্রথম প্রকাশ, জানুয়ারি ২০০১,

(ঝ) 'স্ত্রীলিঙ্গ নির্মাণ', মল্লিকা সেনগুপ্ত, তৃতীয় মুদ্রণ, জুলাই ২০০৮,

(ঞ) 'নৈতিকতা ও নারীবাদ', শেফালী মৈত্র, দ্বিতীয় সংস্করণ, জুন ২০০৭,

(চ) 'ইকোফেমিনিজম নারীবাদ ও তৃতীয় দুনিয়ার প্রান্তিক নারী', বিপ্লব মাজী,